#আমি পদ্মজা পর্ব৪৫ প্রথম খন্ড

_____

দেখতে দেখতে চলে এসেছে শীতকাল। সকাল দশটা বাজে। অথচ,কুয়াশার চাদরে চারিদিক ঢাকা। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা। মনটা কু গাইছে। বুকে অজানা একটা ঝড় বইছে। স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে পারছে না। ঢাকা আসার পর থেকে নিয়মিত পূর্ণার লেখা চিঠি পেত। প্রায় চার মাস হলো বাড়ি থেকে কোনো চিঠি আসছে না। পদ্মজা নয়টা চিঠি পাঠিয়েছে। একটারও উত্তর আসেনি। বাড়ির সবার কথা খুব মনে পড়ছে। ব্যালকনি ছেড়ে রুমে চলে আসে পদ্মজা। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়। একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখে। হাওলাদার বাড়িতে টেলিফোন এনেছে। পূর্ণা হাওলাদার বাড়িতে এসে পদ্মজার সাথে যোগাযোগ করে। পদ্মজা কথা বলতেই

ওপাশ থেকে পূর্ণার উল্লাস ভেসে আসল,
‘আপা? আপা আমি তোমার গলার স্বর শুনতেছি। তুমি শুনছো?’
‘শুনছি। কেমন আছিস? আম্মা কেমন আছে? বাড়ির সবাই ভালো আছে?’
‘সবাই ভালো। তুমি কেমন আছো? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার গলার স্বর শুনছি!’
‘আচ্ছা,শোন?’
‘বলো আপা।’
‘আশেপাশে কেউ আছে?’
‘খালাম্মা আছে।’
‘এই বাড়িতে আর আসবি না। আমি যতদিন না আসব। মনে রাখবি?’
‘কেন? কেন আপা?’
‘মানা করেছি,শুনবি।’
‘আচ্ছা,কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এবার প্রতিদিন দুলাভাইয়ের বাড়িতে আসব। আর তোমার

সাথে কথা বলব। ধুর!’
‘আবার যখন আসব আমাদের বাড়িতে টেলিফোন নিয়ে আসব। এরপর প্রতিদিন আমাদের কথা হবে। এখন আমার মানা শোন।’
‘টাকা কই পাবে?’
‘সেদিন উনি বলেছেন, নিয়ে আসবেন। আমি মানা করেছিলাম। বললেন, তুমি আনন্দে থাকলেই আমার সুখ। তোমার সুখের জন্যই এখন আমার সব। আর কী বলার?’
‘দুলাভাই খুব ভালো তাই না আপা?’
‘হুম। আম্মার শরীর সত্যি ভালো আছে?’
‘আছে। আগের চেয়ে ভালো।’
‘খেয়াল রাখিস আম্মার।’
‘রাখব।’

বাতাসটা বেড়েছে। পদ্মজার গা কাঁটা দিচ্ছে। আচমকাই ঘুমটা ভেঙে যায়। চট করে উঠে বসে। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল,টেলিফোন

নেই। একদম বাস্তবের মতো অনুভূতি হচ্ছিল। পদ্মজা দেয়াল ঘড়িতে দেখে, এগারোটা বাজে। টেলিফোন পুরো দেশে হাতেগোনা কয়জনের বাসায় আছে। সেখানে গ্রামে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যাবে ভাবা হাস্যকর।

পদ্মজা বিছানা ছেড়ে ড্রয়িংরুমে চলে আসে। কপালে হাত দিয়ে দেখে গায়ে জ্বর এসেছে।পূর্ণার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। রান্নাঘরে যেতে যেতে ডাকল,'মনা?'

পরক্ষণেই মনে পড়ল,মনা বাসায় নেই। দুইদিন আগে বাড়িতে গিয়েছে। খুব একা লাগছে তার। সবকিছুই রান্না করা আছে। আর কী রাঁধবে? এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া যায়। পদ্মজা এক কাপ চা নিয়ে ড্রয়িংরুমের জানালার পাশ ঘেঁষে বসল। গ্রামের সোনালি দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। মোর্শেদ প্রথম যেদিন সোয়েটার কিনে

দিয়েছিলেন সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। সকাল সকাল উঠে খেজুরের রস দিয়ে পিঠা খাওয়া। কত লোভনীয় সেই দিনগুলো। কলিং বেল বেজে উঠল।

অসময়ে কলিং বেল শুনে পদ্মজা অবাক হলো। আমিরতো এখন আসবে না। দুই ঘন্টা আগেই বের হলো। তাহলে কে এসেছে? গায়ে শাল টেনে নিল সে। এরপর দরজা খুলল। দরজার সামনে আমির দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা অবাক হয়ে জানতে চাইল,'এতো দ্রুত?'
'তৈরি হও,বাড়িতে যাব।'
পদ্মজা চোখের পলক ফেলে আবার তাকাল। বলল,'বাড়িতে মানে অলন্দপুর?'
আমির দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলল,'হুম। দ্রুত যাও। শাড়ি পাল্টাও।'
পদ্মজার উৎকণ্ঠা,'হুট করে যে! কোনো খারাপ খবর?'

আমির হেসে বলল,’তেমন কিছুই না। কয়দিন ধরে দেখছি মন খারাপ করে বসে থাকো। তাই হুট করে যাওয়ার কথা ভাবলাম। তোমার কলেজ তো শীতের বন্ধই আছে। আমি এক সপ্তাহর জন্য ম্যানেজারকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। আর আলমগীর ভাইয়া এসেছে। কোনো চিন্তা নেই। এবার দ্রুত যাও। ট্রেন বারোটায়। আজকের শেষ ট্রেন কিন্তু এটাই। আমি তৈরি আছি। শুধু লাগেজে দুই তিনটা শার্ট ঢুকিয়ে নিলেই হবে।’

পদ্মজা আর কিছু বলল না। ছুটে যায় দুই তলায়। তার হৃৎপিণ্ড খুশিতে দামামা বাজাচ্ছে। দশ মিনিটের ব্যবধানে শাড়ি পাল্টে, লাগেজও গুছিয়ে ফেলে। দুজন বেরিয়ে পড়ে। গন্তব্য অলন্দপুর। দীর্ঘ আট মাস পর জন্মস্থান, জন্মদাত্রী, জন্মদাতা,ভাই-বোন সবাইকে দেখতে পাবে পদ্মজা। ভেতরে ভেতরে

উত্তেজনা এতোটাই কাজ করছে যে,শীতের প্রকোপ টের পাচ্ছে না সে।

কেবিনে ঢোকার পর থেকে বার বার এক কথাই বলে চলেছে পদ্মজা,'কতদিন পর যাচ্ছি! আম্মা হুট করে আমাকে দেখে জ্ঞান না হারিয়ে ফেলে। পূর্ণা নিশ্চিত জ্ঞান হারাবে।'
আমির হাসল। পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,'আসো গল্প করি।'
পদ্মজার তাকাল। তার চোখ দুটি হাসছে। চিকমিক করছে। সে প্রশ্ন করল,'আলমগীর ভাইয়া আমাদের বাসায়ই উঠবেন?'
'না। অফিসেই থাকবে।"
'রানি আপা ভালো আছে? কিছু বলছে?'
আমির চুল ঠিক করতে করতে ব্যথিত স্বরে বলল,'ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। বাচ্চা নষ্ট করতে দিল না। এরপর মৃত বাচ্চা জন্ম দিল। এখন অবস্থা আরো করুণ। ঘরেই বন্দী।'

‘ইশ! খারাপ লাগে ভাবলে। মানুষের কপাল এতো খারাপ কী করে হয়!’

_____

মোড়ল বাড়ির সড়ক দেখা যাচ্ছে। পদ্মজা খুশিতে আত্মহারা। দ্রুত হাঁটছে। সে কখনো বাহারি শাড়ি, বোরকা পরে না। আজ পরেছে। শাড়ি বোরকা দুটোতেই ভারী কাজ,চকচক করা ছোট-বড় পাথর।। দেখলে মনে হয়,হীরাপান্না চিকচিক করছে। সে তার মাকে দেখাতে চায়,সে কতোটা সুখী। কোনো কমতি নেই তার জীবনে। মোড়ল বাড়ির গেইট ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সব আনন্দ,উল্লাস নিভে যায়। পূর্ণা,প্রেমা দাঁড়িয়ে আছে। দুজনকে চেনা যাচ্ছে না। শুকিয়ে কয়লা হয়ে গেছে।
চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। গাল ভাঙা। গায়ে শুধু হাড্ডি। মনে হচ্ছে কতদিন অনাহারে কাটিয়েছে। পূর্ণা পদ্মজাকে দেখেই ‘আপা’

বলে কেঁদে উঠল। ছুটে না এসে মাটিতে দপ করে শব্দ তুলে বসে পড়ল। প্রেমা দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। কাঁদতে থাকল। পদ্মজা বাকরুদ্ধ। অজানা
আশঙ্কায় গলা শুকিয়ে আসছে। চোখ দুটো খুঁজতে থাকল মাকে। পদ্মজা আমিরের দিকে তাকাল। আমিরের চোখ অস্থির। পদ্মজা প্রেমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আড়চোখে দেখে,পূর্ণা হাউমাউ করে কাঁদছে। কেন আসছে না ছুটে? কীসের এতো কষ্ট ওর?

পদ্মজা এগিয়ে আসে। পূর্ণাকে টেনে তুলে ক্ষীণ স্বরে বলল,'এতো শুকিয়েছিস কেন?
আম্মা...আম্মা ভালো আছে?'

'আপা...আপারে।' বলে পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল পূর্ণা। পদ্মজা ঘরের ভেতর তাকায়। কয়েক জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। অজ্ঞাত ভয়ে গলা দিয়ে কথা

আসছে না তার। পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর ঢুকল পদ্মজা। সদর ঘরে চেনা অনেকগুলো মুখ। প্রতিবেশী সবাই। আপন মানুষগুলো কোথায়? পদ্মজা আরো দুই পা এগিয়ে আসে। উঠান থেকে মনজুরার কণ্ঠ ভেসে আসে,'পদ্ম আইছে,পদ্ম...'

সদর ঘরের মধ্যখানে পাটিতে শুয়ে আছেন হেমলতা। গায়ের উপর কাঁথা। মেরুদণ্ড সোজা করে শুয়ে আছে। গোলাপজলের ঘ্রাণ চারপাশে। পদ্মজার বুকের হাড়গুলো যেন গুড়োগুড়ো হতে শুরু করল। বুকে এতো ব্যাথা হচ্ছে! সে হেমলতার পাশে বসল। নিস্তরঙ্গ গলায় ডাকল,'আম্মা? ও আম্মা?'

হেমলতা পিটপিট করে তাকান। চোখ দুটি ঘোলা। গাল ভেঙে গেছে। চোখ দুটি গভীর গর্তের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার পথে। পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন।

চিনতে পারলেন না। পদ্মজা হেমলতার এক হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু দিল। দুই ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে হেমলতার হাতে। তাতেও হেমলতার ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি নিজের মতো ঘরের ছাদে তাকিয়ে আছেন। মনজুরা সদর ঘরে ঢুকেই বিলাপ শুরু করেন মাত্র,পদ্মজা জোরে চেঁচিয়ে উঠল,'চুপ করো। কেউ কাঁদবে না। চুপ করো।'

সবার কান্না থেমে যায়। পদ্মজা হেমলতাকে বলল,'ও আম্মা? কথা বলো? আমি...আমি তোমার পদ্মজা। তোমার আদরের পদ্মজা।'

'আম্মা চারমাস ধরে কাউকে চিনে না আপা।' পূর্ণা ডুকরে কেঁদে উঠল। পদ্মজার চোখ পড়ে সদর ঘরের কোণে। মোর্শেদ কপালে হাত দিয়ে বসে আছেন। মানুষটাকে চেনা যাচ্ছে না একদমই। পিঠের হাড্ডি ভেসে আছে। পদ্মজা বাকহীন হয়ে পড়েছে। কিছু বলবে নাকি

কাঁদবে? বুকে কেমন যেন হচ্ছে! শরীরের শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে। পদ্মজা দুই হাতে হেমলতার মাথা তুলে ধরল। হেমলতা তাকান। নিষ্প্রাণ চাহনী। হেমলতার মাথাটা পদ্মজা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। আকুল ভরা কণ্ঠে বলল,একবার কথা বলো আম্মা? একবার দুই হাতে জড়িয়ে ধরো।'

হেমলতার হাত দুটো নেতিয়ে আছে মাটির উপর। পূর্ণা খেয়াল করে হেমলতার হাত দুটি কাঁপছে। চেষ্টা করছে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরার কিন্তু পারছেন না। তাহলে কী পদ্মজাকে চিনতে পেরেছেন? পদ্মজা কাঁদতে থাকল। অনেকে অনেক কিছু বলছে। কারো কথা কানে ঢুকছে না। শুধু বুঝতে পারছে,এই পৃথিবীর বুক থেকে তার মা হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে হেমলতা। হারিয়ে যাচ্ছে তার কল্পনার রাজ্যের রাজরানী। স্বপ্ন তো সব পূরণ

হয়নি! এ তো কথা ছিল না। তবে কেন এমন হচ্ছে? পদ্মজার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সারা শরীর বিষিয়ে যাচ্ছে। কাঁপা ঠোঁটে হেমলতার পুরো মুখে চুমু খেল পদ্মজা। ভারি করুণ ভাবে বলল,'ও আম্মা? কোথায় হারালো তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,ঝাঁঝালো কণ্ঠ?'

কেটে যায় অনেকটা মুহূর্ত। কাছের মানুষেরা ছাড়া আর কেউ নেই। কারো মুখে রা নেই। হেমলতার মতোই সবাই বাকহীন, স্তব্ধ। কেউ খায়নি। বাসন্তী গুপ্ত ব্যাথা নিয়ে রেঁধেছেন। প্রেমা-প্রান্ত,আমির ছাড়া কেউ খেল না। পদ্মজাকে অনেক জোরাজুরি করেছে আমির। পদ্মজা খেল না। আমিরও আর ঘাঁটল না। পদ্মজা জানতে পারল, দুই মাস ধরে হেমলতা বিছানায় পড়ে আছেন। এক দুটো কথা বলেন মাঝে মাঝে। চারদিন ধরে তাও বলেন না। গতকাল ভোরে মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়েছে।

এমন অবস্থা হয়েছিল, সবাই ভেবেছিল আত্মাটা বেরিয়েই যাবে। হাওলাদার বাড়ি থেকে সবাই দেখতে আসে। তখন জানা যায়,আলমগীর ঢাকা যাচ্ছে। মোর্শেদ অনুরোধ করে বলে,পদ্মজা আর আমিরকে খবর দিতে। ওরা যেন দ্রুত চলে আসে। রাতের ট্রেনে সকালে গোডাউনে পৌঁছে আলমগীর। আমিরকে সব বলে। আমির সব শুনে আর দেরি করেনি। পদ্মজাকে নিয়ে চলে আসে। পথে কান্নাকাটি করবে,তাই কিছু বলেনি। পদ্মজা এতসব জেনে কিছু বলল না। অভিমানের পাহাড় তৈরি হয়েছে মনে। কারো কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। সারাক্ষন চেষ্টা করছে,হেমলতার সাথে কথা বলার। হেমলতা কিছুতেই কথা বলছেন না। একটু-আধটু পানির বেশি আর কিছুই খাচ্ছেন না। গায়ে মাংস বলতে নেই। চামড়া ঝুলে গেছে। পদ্মজা হেমলতার পুরো শরীর মুছে দিয়ে কাপড়

পাল্টে দিল। এরপর শোয়া অবস্থায় অযু করাল। ঠোঁট ভেঙে কেঁদে আরো একবার আকুতি করল,'একবার কথা বলো আম্মা। একবার ডাকো পদ্মজা বলে।'

হেমলতা তাকালেন। কিছু বললেন না। তাকিয়েই রইলেন। মাঝরাতে সবাই যখন ঘুমে,পদ্মজা জেগে। ক্লান্ত হয়ে সবার চোখ দুটি লেগে গেলেও,তার চোখ দুটি পলকও ফেলছে না। মনে হচ্ছে,কে যেন চারপাশে ঘুরছে তার মাকে নিয়ে যেতে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,শেয়ালের হাঁক ছাপিয়ে সে যেন কারো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। অবচেতন মন, আজরাইলের উপস্থিতি অনুভব করছে। পদ্মজার বুকে ভয় জেঁকে বসে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। এদিকওদিক তাকিয়ে কেঁদে অনুরোধ করে,'অনুরোধ করছি,আমার মাকে কষ্ট দিবেন না।'

মুখে হাত চেপে কান্না আটকানোর প্রচেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হতে থাকল পদ্মজা। কাঁদতে কাঁদতে কণ্ঠ নিভে এসেছে। ঠান্ডায় শরীর জমে গেছে। চোখটা লেগেছে মাত্র,তখনি দপদপ একটা শব্দ ভেসে আসে। পদ্মজা চমকে তাকাল। হেমলতা হাত দিয়ে মাটি থাপড়াচ্ছেন। শরীর কাঁপছে। পদ্মজার নিঃশ্বাস থেমে যায়। হেমলতার এক হাত শক্ত করে ধরে কেঁদে উঠে বলল, 'আম্মা,আম্মা যেও না আমাকে ছেড়ে। ও আম্মা। আম্মা...আমার কষ্ট হচ্ছে আম্মা। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? আম্মা পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে যেও না। আম্মা...আম্মা।'

পদ্মজা দ্রুত হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। সবার ঘুম ছুটে যায়। একসাথে করুণ কান্নার স্বরে ভেসে উঠে মোড়ল বাড়ি। পদ্মজা কাউকে অনুরোধ করে

বলে,’নিয়েন না আমার আম্মাকে। কষ্ট দিচ্ছেন কেন এতো? আমার আম্মার কষ্ট হচ্ছে। আম্মা। ও আম্মা। আম্মা আমাকে ছেড়ে যেও না।’

পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে সূরা ইয়াসিন পড়া শুরু করল। হেমলতা শেষবারের মতো উচ্চারণ করেন,’লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।’

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আত্মাটা বেরিয়ে যায়। শরীরের কাঁপাকাঁপি থেমে যায়। দেহটা শুধু পড়ে রয় পরিত্যক্ত বস্ত্রের মতো। পদ্মজা দেহটাকে খামচে জড়িয়ে ধরে আম্মা বলে চিৎকার করে উঠল। আশেপাশের সব বাড়ি থেকে মানুষ ছুটে আসে। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারায়। ফজরের আযান পড়ছে। আমির পদ্মজাকে হেমলতার থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। কিছুতেই প্রাণ বিহীন দেহটা পদ্মজা ছাড়তে চাইল না। যেন তার ডাকেই ফিরে

আসবে হেমলতা। এমন কী হতে পারে না? হেমলতা কথা বলে উঠলেন। আবার হাঁটলেন। পদ্মজাকে ধমকে বললেন,'চুপ! এতো কীসের কান্না? আমার মেয়ে হবে শক্ত আর কঠিন মনের। এতো নরম হলে চলবে না।'

এটা শুধুই কল্পনা। আত্মা একবার দেহ ছেড়ে দিলে আর ফিরে আসে না। আপন ঠিকানায় ফিরে যায়। হেমলতা নামে মানুষটার আয়ুকাল এতটুকুই ছিল। তিনি উড়াল দিয়েছেন পরকালে। রেখে গেছেন আদরের তিন কন্যা। আদরের কন্যাদের ছেড়ে তো কখনো দূরে থাকতে পারতেন না! এবার কীভাবে চলে গেলেন? তিনি নিশ্চয় মৃত্যুর সাথে কঠিন যুদ্ধ করেছেন! পেরে উঠেননি।

_____

ভোরের আলো ফুটতেই পদ্মজা নিজেকে শক্ত করল। গোসল করে এসে কোরআন শরীফ

নিয়ে বসল। হেমলতা বলতেন,’মা-বাবা মারা গেলে কান্নাকাটি না করে লাশের পাশে বসে কোরঅান শরীফ পড়া ভালো। এতে করে কবরে আযাব থাকলে কম হয়। (এই কথার কোনো সত্যতা নেই। তবে অনেক গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।)

সে প্রতিটা অক্ষর পড়ছে আর কাঁদছে। জীবনের আকাশের সাতরঙা রংধনু নিভে গেছে। আর কখনো উঠবে না। কোনোদিন না। মোর্শেদ পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে চোখের জল মুছছেন। আবার ভিজে যাচ্ছে। গোসলের পর হেমলতার মুখটা উজ্জ্বল হয়েছে। ঠোঁটের কোণে যেন হাসি লেগে আছে। পদ্মজা হেমলতার মৃত দেহের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাদা কাপড়ে মোড়ানো লম্বা দেহটা দেখে বুকটা হাহাকার করে উঠে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,’আমি জানি,তোমার রুহ আমার

পাশেই আছে। এভাবে কথা না ভাঙলেও পারতে আম্মা। বলেছিলে, কখনো কিছু লুকোবে না! বেহেশতে ভালো থেকো আম্মা। আমি পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্তকে দেখে রাখব।’

এরপর হাটুভেঙে খাঁটিয়ার সামনে বসল। হেমলতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,’আল্লাহকে বলে খুব দ্রুত আমাকে নিতে এসো কিন্তু।’

আমির,হিমেল সহ আরো দুইজন খাঁটিয়া কাঁধে তুলে নিল। কালিমা শাহাদাত বলতে বলতে তারা সামনে এগোয়। পূর্ণাকে তিনজন মহিলা ধরে রেখেছে। সে হাত পা দিয়ে ঝাঁপিয়ে চেষ্টা করছে ছোটার। তার ইচ্ছে হচ্ছে মৃত দেহটাই আঁকড়ে ধরে রাখতে। পদ্মজা মাটিতে বসে পড়ে। কী যেন বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! আম্মা...আম্মা বলে দুই হাতে মাটি খামচে ধরে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, বিড়বিড় করে,’আমার

আম্মাকে কষ্ট দিও না মাটি। একটুও কষ্ট দিও না। আমার আম্মাকে যত্নে রেখ। হীরের টুকরো তোমার বুকে ঘুমাতে যাচ্ছে। কষ্ট দিও না...কষ্ট দিও না।'

_____

হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপছে পদ্মজা। সন্ধ্যে থেকে খুব ঠান্ডা পড়েছে। এক কাপড়ে মাটিতে মা একা আছে ভেবে পদ্মজার অশান্তি হচ্ছিল। তাই কম্বল নিয়ে রাতের বেলা ছুটে আসে মায়ের কবরে। সদ্য হওয়া কবরের কাঁচা মাটির ঘ্রাণ আসছে। পদ্মজা কম্বল দিয়ে মায়ের কবর ঢেকে দিল।এরপর দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আম্মা...মনে আছে তোমার? যখন আমি ছোট অনেক। আব্বা আমার গায়ের কম্বল নিয়ে গিয়েছিল। তখন তুমি তোমার শাড়ির আঁচল দিয়ে সারারাত আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলে? মনে আছে?

আমাকে কেন সেই সুযোগ দিলে না? কেন বললে না,তুমি মরণ রোগে আক্রান্ত। আমার জীবনে অভিশপ্ত আক্ষেপ কেন দিয়ে গেলে আম্মা? কেন পেলাম না আমার মাকে সন্তানের মতো আদর করার সুযোগ ? কোন দোষে আমার সঙ্গ তুমি নিলে না?
মৃত্যুর আগে নিজের মেয়ের সাথে এতো বড় অনাচার করে গেলে আম্মা! বিশ্বাসঘাতকতা করলে। আমিতো তোমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতাম। কখনো কোনো বিষয়ে জোর করিনি। জোর করে জানতে চাইনি। আমি বিশ্বাস করতাম তুমি সব বলবে আমায়। তুমি নিজে আমাকে বার বার বলেছো,তোমার জীবনের এক বিন্দু অংশ থাকবে না যা আমাকে বলবে না। তবে কেন সেই কথা রাখতে পারলে না? আমার কষ্ট হচ্ছে আম্মা। তুমি অনুভব করছো? আমি তোমার বুকে শুয়ে অভিযোগ তুলছি, তুমি আমার সাথে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছো! আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছো দশ মাস। তুমি পারতে,আমাকে বলতে। তুমি পারতে আমাকে বিয়ে না দিয়ে নিজের কাছে রাখতে। তুমি পারতে আমাকে আরো দশ মাস আমার মায়ের সঙ্গ দিতে। আমি এতো আক্ষেপ নিয়ে কী করে বাঁচবো আম্মা?’

কয়েকটা শেয়াল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝরাতে কবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ কাঁদতে পারে,এমন হয়তো কখনো দেখেনি তারা। পদ্মজা হেমলতার কবরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর অশ্রু বিসর্জন করছে। আত্মহত্যা পাপ না হলে হয়তো এই পথই বেছে নিত সে। মোর্শেদ,আমির টর্চ নিয়ে পদ্মজাকে খুঁজতে খুঁজতে কবরে আসে। হেমলতার কবর দেখে মোর্শেদ দূর্বল হয়ে পড়েন। পদ্মজার সাথে সাথে তিনিও কাঁদতে থাকেন। আমিরের

শব্দভান্ডারে স্বান্ত্বনা মজুদ নেই। সে সাহস করতে পারল না কথা বলার। কান্না থামিয়ে পদ্মজা মুখস্থ সূরা ইয়াসিন পড়তে থাকল। সে চায় না তার মায়ের বিন্দুমাত্র কষ্ট হউক কবরে। সন্তানের আমল নাকি পারে,মৃত মা-বাবার শাস্তি কমাতে। যদি কোনো পাপের শাস্তি হেমলতার আমলনামায় থেকে থাকে তা যেন মুছে যায় পদ্মজার কণ্ঠের মধুর স্বরে। ধীরে ধীরে পদ্মজার কণ্ঠ কমে আসে। ঠান্ডায় জমে যায়। চোখের মণির রং পাল্টে যায়। আমির দ্রুত পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। এরপর মোর্শেদকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। হেমলতা পড়ে রইলেন একা একা। শেয়ালগুলি একসাথে চেঁচিয়ে উঠল। মৃত্যুর মতো সত্য আর নেই। জন্মালে মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করতেই হবে।

_____

হেমলতার ঘরে পদ্মজা আর পূর্ণা বসে আছে, দরজা বন্ধ করে। পুরো বিছানা জুড়ে হেমলতার পরনের কাপড়চোপড়। এসবই শেষ স্মৃতি। পূর্ণা দুটো শাড়ি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে থেমে থেমে কাঁদছে। পদ্মজা মাটিতে বসে আছে। উসকোখুসকো চুল। পূর্ণা আর কাঁদতে পারছে না। বুক ফেটে যাচ্ছে তবুও শব্দ বেরোচ্ছে না। পদ্মজা হেমলতার চুড়ি দুটো হাতে নিয়ে বলল,'আম্মা বলে এখন কাকে ডাকব? পূর্ণা আমাদের আম্মা কই গেলো?'

পূর্ণা বিছানা থেকে নেমে আসে। পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা স্বরে বলল,'আল্লাহ কেন এমন করলো আপা? আমাদের প্রতি একটু দয়া হলো না।'

'এই ঘরটায় আর আসবে না আম্মা!'

'আপা,আম্মা আসে না কেন? আপা...আমার

শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমাকে মেরে ফেলো।’
‘কাঁদিস না বোন। আমাদের সবার আবার দেখা হবে পরকালে। এরপর আর মৃত্যু নেই। অনন্তকাল একসাথে থাকব। ঠিক দেখা হবে।’

পালঙ্কের উপর একটা পুরনো খাতা। পদ্মজা হাত বাড়িয়ে নিল। পূর্ণা এই খাতার প্রতিটি অক্ষর আগেই পড়েছে। তাই আর ঘাঁটল না। সে ক্লান্ত দেহ নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা খাতার পৃষ্ঠা উল্টায়,

আমার আদরের পদ্মজা,

আজ পনেরো দিন তোর বিয়ের। প্রতিটা রাত আমার নির্ঘুমে কাটে। পুরো বাড়িজুড়ে তোর স্মৃতি। স্মৃতিগুলো আমায় বিষে জর্জরিত করে দেয়। মেয়ে হয়ে জন্মালে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হয়। তবুও মানতে কষ্ট হচ্ছে,আমার মেয়ে সারাজীবনের জন্য অন্যের ঘরে চলে গিয়েছে। বলেছিলাম,আমার জীবনের

বিন্দুমাত্র অংশ তোর অজানায় রাখব না। সেই কথা রাখতে আমি লিখতে বসেছি। স্বপ্ন ছিল,তোকে অনেক পড়াব।
অনেক...অনেকদিন নিজের কাছে রাখব।
কিন্তু মানুষের সব স্বপ্ন কী পূরণ হয়? দীর্ঘ দুই বছর আমার শরীরে বাসা বেঁধে ছিল এক রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। কিন্তু পাত্তা দেইনি। যখন তোর মেট্রিক পরীক্ষার জন্য আকবর ভাইজানের বাড়িতে গেলাম তখন একজন ভালো ডাক্তারের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আকবর ভাইজানের বন্ধু। দেখা করতে এসেছিলেন। তখন তুই পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিলি। উনার নাম আসাদুল জামান। বিলেত ফেরত ডাক্তার। কথায় কথায় আমার সমস্যাগুলোর কথা বলি। তিনি খালি চোখে আমাকে দেখেন। কিছু প্রশ্ন করেন। উনার ধারণা জানান, আমি পারকিনসন্স ডিজিস নামক প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। যার ৮০ ভাগ লক্ষণ আমার সাথে

মিলে যায়। তিনি দ্রুত আমাকে পরীক্ষা করতে বলেন। এই রোগের চিকিৎসা তো দূরে থাক দেশে এই রোগ পরীক্ষার কেন্দ্রও হাতেগোনা ১-২ টা আছে। সেদিনটা আমার জীবনের বড় ধাক্কা ছিল। আমি দিকদিশা হারিয়ে ফেলি। আমি মারা গেলে আমার তিন মেয়ের কী হবে? কী করে বাঁচবে? ভয়ানক এই রোগ নিয়ে তোর সামনে হাসতে আমার ভীষণ কষ্ট হতো। তবুও হাসতে হতো। মুহিব খুব ভালো ছেলে। তাই তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেইনি। আমি মারা যাওয়ার আগে তোর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম। বিয়ে ঠিক করে ফিরে আসি গ্রামে। প্রতিটা দিন,প্রতিটা মুহূর্ত অসহনীয় যন্ত্রনায় কাটতে থাকে। আসাদুল জামান ঢাকার এক হাসপাতালের নাম লিখে দিয়েছিলেন। যেখানে এই রোগের পরীক্ষা করা হয়। ১০০ ভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা করানোটা জরুরি। তার জন্য কেউ একজনকে দরকার

পাশে। তোর আব্বাকে সব বলি। সব শুনে তোর আব্বা হাউমাউ করে বাচ্চাদের মতো কেঁদেছে! আল্লাহর উপর ভরসা রেখে,চলে যাই ঢাকা। আমি তখন হুঁশে ছিলাম না। মৃত্যু আমার পিছনে ধাওয়া করছিল। তাই মাথায় আসেনি,আমি না থাকলে আমার মেয়েদের কোনো ক্ষতি হতে পারে। ঢাকা যাওয়ার পথে আল্লাহর কাছে আকুতি করি,যেন পরীক্ষায় কিছু ধরা না পড়ে। বিয়েটা ভেঙে দিতে পারি। আর আমার মেয়েদেরকে নিয়ে আরো কয়টা বছর বাঁচতে পারি। কিন্তু আল্লাহ শুনলেন না। তিনি দয়া করলেন না মা! জানতে পারি,আমার হাতে সময় কম। এ রোগের নিরাময় নেই। যেকোনো বছরে যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি। এই কথা শোনা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোদের কথা মনে পড়তেই আবার নিজেকে শক্ত করে নিয়েছি। যতদিন বাঁচব শক্ত হয়ে বাঁচব। তোর

জীবন গুছিয়ে দিয়ে যাব। আমি পেরেছি। তোর বিয়ে হয়েছে। ভালো ছেলের সাথে। সুখে আছিস। এইতো শান্তি। আমার ভাবতে কষ্ট হয়, একদিন তোকে, তোদের সবাইকে আমি ভুলে যাব। এখন তো কথা ভুলে যাই। তখন নিজের নাড়ি ছেড়া সন্তানদের মুখও অচেনা হয়ে যাবে। কী নির্মম তাই না মা?

তুই ঢাকা চলে গিয়েছিস অনেকদিন হলো। আমার মনে হচ্ছে,আমাদের আর দেখা হবে না। আমার শরীরের অবস্থা ভালো না। আজ নাকি প্রান্তকে চিনতে পারিনি আমি। বেশ অনেক্ষণ ওর চেহারাটা আমার অচেনা লেগেছে। কী অদ্ভুত! ভুলে যেয়ে আবার মনে পড়ে। হাত, পা, মাথা মুখের থুতনি, চোয়াল মাঝে মাঝে খুব কাঁপে। ধীরে ধীরে শরীরের ভারসাম্য একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। লাহাড়ি ঘরে গিয়েছিলাম,হুট করে চৌকির উপর থেকে

পড়ে গিয়েছি। পূর্ণার সে কী কান্না! মেয়েটা খুব কাঁদুনে হয়েছে। একদমই হাঁটতে ইচ্ছে করে না। শক্তি কুলোয় না। তোর কথা খুব মনে পড়ে। বৃদ্ধ হয়ে তোর শরীরে ভর দিয়ে হাঁটার ইচ্ছে ছিল মনে। পেটের চামড়ার ফোস্কার মতো কী যেন হয়েছে। চুলকায়, ব্যাথা করে। রাতে ঘুম হয় না যন্ত্রনায়। তোর আব্বা আমার অশান্তি দেখে ঘুমাতে পারে না। বাসন্তী আপা সব জানে। মানুষটা অনেক ভালো। ভুল তো সবাই করে। এমন কেউ আছে? যে জীবনে ভুল করেনি। বাসন্তী আপার রান্না নাকি অনেক মজার হয়। খুব ভালো ঘ্রাণ হয়। প্রান্ত,প্রেমা সারাক্ষণই বলে। কিন্তু আমি সেই ঘ্রাণ পাই না। ঘ্রাণশক্তিটাও লুপ্ত হয়ে গেছে। কয়দিন ধরে টয়লেটও হচ্ছে না। খাবার গিলতে পারি না। কোন পাপে এমন করুণ দশা হলো আমার? বোধহয়, আর শক্তি পাবো না লেখার। পুরনো সবকিছু স্থায়ীভাবে ভুলতে আর কতক্ষণ? সব

লক্ষণ তো জেঁকেই বসেছে শরীরে। বাকি শুধু দুনিয়াটাকে ভুলে যাওয়া। আজ সারারাত জেগে আরো কিছু কথা লিখতে চাই। সেদিন আমি জলিল আর মজনুর ছেলেকে খুন করেছি। ছইদ তার আগেই খুন হয়ে গিয়েছিল। আটপাড়ার বড় বিলের হাওড়ের টিনের ঘরে ওরা তিনজন সবসময় জুয়া খেলে,গাঁজা খায়। সেদিনও গাঁজা খেয়ে পড়েছিল। গিয়ে দেখি ছইদের লাশ এক কোণে পড়ে আছে। দা হাতে দাঁড়িয়ে আছে তোর দেবর রিদওয়ান। ও আমাকে দেখে পালিয়ে যায়। এরকম দৃশ্য দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি তবুও থেমে থাকিনি। ঘুমন্ত জলিল আর মজনুর ছেলেকে বেঁধে....। বাকিটুকু বললাম না। শুধু এইটুকু বলব, আমি যখন জলিল আর মজনুর ছেলেকে কোপাচ্ছিলাম তখন রিদওয়ান ঘরের এক পাশে লুকিয়ে ছিল। সে সব দেখেছে। আমি বের হতেই সে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করে।

আজও জানতে পারিনি,সে কেন ছইদকে খুন করেছে। তুই ঢাকা চলে গিয়েছিস ভেবে শান্তি লাগছে। রিদওয়ান ভয়ংকর মানুষ। তার খুন করার হাত বলছে,এটা তার প্রথম খুন নয়। সাবধানে থাকবি। আমিরকে সাবধানে রাখবি। তোর শ্বাশুড়িকে কাঁদতে দেখেছি। উনাকে আপন করে রাখবি।

আর লেখা যাচ্ছে না। হাত কাঁপছে। কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে চারিদিক। এই খাতাটা প্রান্তের। লুকিয়ে নিয়ে এসেছি। আমার সব শাড়ির সাথে ট্রাঙ্কের ভেতর যত্নে রাখছি। আমার অনুপস্থিতিতে যখন পড়বি কাঁদবি না একদম। জীবনে বড় হবি। আমি না থাকলে মৃত্যুর কামনা করবি না। এটাও এক ধরণের পাপ। আল্লাহর যখন ইচ্ছে হবে মৃত্যু দিবেন। তিনি যে কারণে সৃষ্টি করেছেন,তা পূরণ হলেই মৃত্যু ধেয়ে আসবে। শুধু মৃত্যুর কথা স্বরণ

রাখবি। কোরঅানের পথে চলবি। কোনো পাপে জড়াবি না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবি না। আমাদের আবার দেখা হবে। আমার মায়ের সাথে আবার দেখা হবে। তুইতো আমার মা। আমার পদ্মজা। আমার সাত রাজার ধন। আমার তিন কন্যা আমার অহংকার। আমার বেহেশত। ভালো থাকবি। খুব ভালো থাকবি। মা কিন্তু দেখব। কান্নাকাটি করতে দেখলে ওপারে আমার শান্তি হবে না। তাই কাঁদবি না। আল্লাহ হাফেজ।'

পড়া শেষ হতেই খাতাটা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে পদ্মজা। হাতপা ছুঁড়ে আম্মা,আম্মা বলে কাঁদতে থাকে। তার আর্তনাদে চারিদিক স্তব্ধ হয়ে যায়।

.....

পদ্মজার মাথার ছায়া এভাবেই হারিয়ে যায়। পদ্মজা কী হয়ে উঠতে পারে নিজের ছায়া

নিজে? পারবে ভাই-বোনদের আগলে রাখতে? বাকি রহস্যের কিনারায় পৌঁছাতে? সব প্রশ্নের উত্তর আছে দ্বিতীয় খন্ডে। খুব দ্রুত নিয়ে আসব ২য় খন্ড। জানিয়ে দেব কবে আসবে আমি পদ্মজার পরবর্তী খন্ড। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবে। নিজের দায়িত্ব নিজের। ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য হেমলতা হয়ে উঠুন। অস্থায়ী সময়ের জন্য বিদায়।